মামা-ভাগ্নের গোয়েন্দাগিরি

সুব্রত হালদার

"বল তো এক চোখে দেখা আর দুই চোখে দেখার মধ্যে তফাত কী?" মামা আমাকে বায়োলজি পড়াতে পড়াতে প্রশ্ন করল। মামা, অর্থাৎ আমার মা'র নিজের ভাই। আমার মামাবাড়ি দুর্গাপুরে। মামা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলকাতায় বি কম পড়তে আসে। সেই থেকে আমাদের বাড়িতে। এখন বি কম পাশ করে চাকরির চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে আমার গৃহশিক্ষকও বটে। গত বছর অর্থাৎ সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার সময় বাবার ভাষায় আমার সায়েন্স গ্রুপটা একটু ডাউন ছিল, তাই মামার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ওটাকে আপ করার। মামার নামটা একটু অদ্ভুত, যে-কারণে আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুধু মামা বলেই চালিয়ে যাই। এখানে যেহেতু মামার কথাই লিখতে বসেছি তাই নামটা বলে দেওয়া দরকার। উৎফুল্ল সরকার অর্থাৎ আমি বলি উৎফুল্লমামা। মা'র কাছে শুনেছি ছোটবেলায় মামা সব সময় হাসত। শুয়ে-শুয়ে মাঝে-মাঝেই পিঠ বেঁকিয়ে হাত-পা ছুড়ে হাসা দেখে দাদু ছোট থেকেই মামাকে উৎফুল্ল বলে ডাকা শুরু করেন। একটু বড় হয়ে ওটাই নাম হয়ে যায়। সমস্যা একটু হয়েছিল ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময়। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার রেজিস্টারে নাম লেখার সময়ে দাদুকে প্রশ্ন করেন, "ছেলের নাম?"

দাদু জবাব দেন, "উৎফুল্ল সরকার।"

হেডমাস্টারমশাই সম্ভবত এমন আজগুবি নাম কোনওদিন শোনেননি। চশমার ফাঁক দিয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় আবার প্রশ্ন করেন, "ভাল নাম কী?"

দাদু বলেন, "ভাল হোক খারাপ হোক ওই একটাই নাম, উৎফুল্ল।"

"ওই নামে তো ভর্তি হবে না।"

দাদু এই সমস্যার কথা কোনওদিন ভাবেননি, বললেন, "নাম তো নামই, তার আবার হওয়া না হওয়ার কী আছে। ঝিঙে, পটল, সূর্য, চন্দ্র, হাসি, কান্না সবই যদি নাম হতে পারে তবে উৎফুল্ল কী দোষ করল।"

হেডমাস্টারমশাই বিচক্ষণ মানুষ, দেখলেন তর্ক করে লাভ নেই। দাদুকে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এই নামই রাখছি তবে আনন্দের মাত্রাটা একটু কমিয়ে ওটাকে প্রফুল্ল করে দিচ্ছি, চলবে তো?"

দাদু সানন্দে মত দিলেন, "ভর্তি হওয়াটা বাতিল হয়ে যাবে ভেবে তর্ক জুড়েছিল, এখন নাকও থাকল, নরুনও পাওয়া গেল।"

উৎফুল্লমামা আমার মামা কাম বন্ধু কাম গাইড কাম মাস্টার। একই অঙ্গে হরেক রূপ। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মামার নানা বদখত প্রশ্ন আমাকে ঝামেলায় ফেলে দেয়, আজ যেমন এক চোখ দু'চোখের ব্যাপারটা। বাঁ হাত দিয়ে বা চোখ চেপে দেখলাম, তারপর হাত সরিয়ে দু'চোখে। এমন কয়েকবার করার পর রহস্যটা ধরে ফেললাম। ব্যাপারটার সঙ্গে অঙ্কের ঐকিক নিয়মের একটা মিল থাকায় আরও নিশ্চিত হলাম। মামাকে বললাম, "পারব, এক ইজুকলটু 'মা', এক আর এক দুই ইজুকলটু মা প্লাস মা, 'মামা'। সঙ্গে-সঙ্গে মামা মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে?"

আমি মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, "ইয়ার্কি কোথায়, এই দ্যাখো না," বলে বাঁ হাতে বাঁ চোখ চেপে আমার বাঁ দিকে বসে থাকা মামাকে বললাম,

"এখন শুধু ডান চোখে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সামনের শোকেস-এর উপর রাখা মার ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।" এবার চোখ থেকে হাত সরিয়ে বললাম, "দু' চোখে এবার তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আর শুধু শুধু তুমি আমাকে গাঁট্টা মারলে। এখনও ব্যথা করছে।"

মামা আমার মূল্যবান পরীক্ষাটা উপলব্ধি করে বলল, "ঠিক আছে, পরেরবার যখন গাঁট্টা মারার মতো কাজ করবি তখন গাঁট্টা না দিয়ে এই ভুল গাঁট্টাটা শোধ করব। কিন্তু দু' চোখ আর এক চোখে দেখার তফাতটা বলতে পারলি না তো। তবে শোন, এক চোখে দূরত্ব বোঝা যায় না, দু' চোখে দূরত্ব বোঝা যায়।"

মামার উপযুক্ত ছাত্র আমি, পরীক্ষা, প্রমাণ ছাড়া কিছু মানতে রাজি না। আবার বাঁ হাত দিয়ে বাঁ চোখ চেপে বললাম, "বাজে কথা, এই দ্যাখো আমি বুঝতে পারছি মা'র ছবিটা আমাদের থেকে ন'-দশ ফুট দূরে আছে।"

মামা বলল, "সে তো তুই এটা অনেকবার দেখেছিস বলে একটা আইডিয়া হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারবি এক চোখ বন্ধ করে সুচে সুতো পরাতে গেলে। পরে পরীক্ষা করে দেখিস।"

গাঁট্টা খেয়ে মামাকে ভুল প্রমাণ করতে আমি বদ্ধপরিকর। একলাফে খাট থেকে নীচে নেমে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে মার সুচ ও সুতোর বাক্সটা নিয়ে এলাম, তারপর সরু একটা সুচ বাঁ হাতে ধরে এক চোখ বন্ধ করে ডান হাতে তাতে সুতো পরাতে গেলাম। যতবারই চেষ্টা করি সুতো কিছুতেই সুচের মধ্যে গেল না। দু'চোখ মেলে দেখলাম বারবারই অনেক দূর থেকে সুতো চলে যাচ্ছে। মামার অগাধ জ্ঞানকে স্বীকার করতেই হল।

মামা একটু ভাবুক হওয়ার ভান করে বলল, "বুঝলি তো এক চোখে দেখা ও দু' চোখে দেখার কত তফাত। তা হলে বোঝ যারা চার চোখে দেখে তাদের কত ক্ষমতা।"

আনন্দে মনটা লাফিয়ে উঠল। এইবার মামাকে কুপোকাত করা যাবে। শিওর, কারণ চার চোখ কোনও প্রাণীর নেই সেটা আমি নিশ্চিত। মামাকে বললাম, "চার চোখ বলে কিছু হয় নাকি। তোমার যত্তসব আজগুবি চিন্তা।"

মামা বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়ে বলল, "হয়, হয়।"

আমি বললাম, "হয়, কার?"

মামা বলল, "এর উত্তরটাও জানা নেই, তবে শোন, টিকটিকির।"

আমার আনন্দ আর দেখে কে। জিতে গেছি নিশ্চিত, কারণ টিকটিকি নিয়ে আমার অনেকদিনের গবেষণা, থরো নলেজ আছে। যখনই কোনও টিকটিকি দেখি চুপিসাড়ে লেজটা বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চেপে ধরি। বেচারা দু-একবার ছটপট করে লেজটা খুলে রেখে পালায়। তারপর সেই লেজটা অনেকক্ষণ ধরে লাফাতে থাকে। সেই কারণে টিকটিকির সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আমার অগাধ জ্ঞান। তবে হারাব যখন তখন তর্ক করে না, প্রমাণ দিয়ে মোক্ষমভাবে হারাব। তড়াক করে খাট থেকে নেমে গেলাম। সামনের দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর্দার ফোটোর পিছনে টিকটিকি থাকে সেটা আমি জানি। লাফ দিয়ে ফোটোটা নাড়িয়ে দিতেই দুটো

লেজকাটা টিকটিকি তড়িঘড়ি বেরিয়ে তরতর করে টিউব লাইটের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল। ওখান থেকে আমার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে লেজ তো নেই, তা সত্ত্বেও আমায় এই আক্রমণ কেন?
গর্বিতভাবে খাটে ফিরে এসে বসতে বসতে মামাকে বললাম, "দু' চোখ দিয়ে দ্যাখো এবার টিকটিকির ক' টা চোখ।"

মামা আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "হবে, হবে, তোর হবে। তোর এই যে অনুসন্ধানেচ্ছু মন এটা আমার খুবই ভাল লাগে। তবে চোখের সঙ্গে কান ও মাথাটাও পরিষ্কার রাখতে হবে। আমি এই টিকটিকির কথা বলছি না সেটা ধরা উচিত ছিল।"

মামাকে হারানোর চেষ্টা আমাকে পেয়ে বসেছে, বললাম, "তুমি যে টিকটিকির কথাই বলো, চোখ ওই দুটোই। আমি পান্তুদের বাড়িতেও টিকটিকি দেখেছি, সব টিকটিকিরই দুটো চোখ। এমনকী, ডাইনোসরেরও দুটো চোখ।"

মামা বলল, "আমি যে টিকটিকির কথা বলছি তারা মানুষ, সামনে দুটো চোখ, এই তোর আমার মতো। কিন্তু পিছনেও দুটো চোখ থাকে যা দেখা যায় না। তবেই না তারা টিকটিকি হতে পারে। বুঝলি না তো? ডিটেকটিভ, ডিটেকটিভ!"

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। মামা ডিটেকটিভ গল্পের পরম ভক্ত। শার্লক হোম্‌স থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাকাবাবু এমনকী দীপক পর্যন্ত সব ডিটেকটিভ বই মামা গুলে খেয়েছে। বাড়িতেও বিরাট স্টক। মামাকে বললাম, "বায়োলজি পড়াতে পড়াতে হঠাৎ তোমার ডিটেকটিভের কথা মনে আসার কারণ?"

মামা বলল, "ভাবছি নিজে কিছু করব। অনেকদিন ধরেই মাথায় আছে। এখন ঠিক করলাম একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলব। এই একটা লাইনেই এখনও কম্পিটিশন নেই বললেই চলে। তবে ব্যাপারটা আমার মাথায় খেলেও ভাল। যাকে বলে কোর কম্পিটেন্সি সেটা আমার আছে।"

আমারও ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। মামাকে সলজ্জভাবে বললাম, "তোমার তো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে, যেমন ফেলুদার তোপসে, কাকাবাবুর সন্তু, তাই না?"

মামা আমার মনের ইচ্ছেটা সাচ্চা ডিটেকটিভের মতো ধরে ফেলল, "তা তো লাগবেই। তোর কথাটা ভেবে দেখা যাবে, তবে বুদ্ধিতে একটু শান দিতে হবে। যাই হোক, কালকেই জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলে বাড়ির সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।"

পরদিন মামা বাবার কাছে গেল। বাবাকে একটু সমীহ করে চলে। ভয়ে ভয়ে মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করতেই বাবা আড়চোখে একবার মামাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, "চাকরির চেষ্টা করছিলে, সেটা কি চুলোয় গেল?"

মামা তাড়াতাড়ি বলল, " না জামাইবাবু, ওটা তো চলবেই। আর ডিটেকটিভ এজেন্সি তো পার্ট টাইমের কাজ, চাকরি করে করা যায়।"

বাবা মামার দিকে না তাকিয়ে দাড়ি কাটতে কাটতে বললেন, "চাচ্ছ যখন তখন করো, তবে সাইনবোর্ডটোর্ড লাগিয়ে প্রথমেই রং মেখে সঙ সাজার কোনও দরকার নেই। আগে কয়েকটা কেস করে হাত পাকাও, তারপরে দেখা যাবে।"

মামা ফিরে এল, ওইটুকু অনুমতিতেই খুশি। সেইদিনই বিকেলে বাজার থেকে একটা বাক্স নিয়ে ফিরল। আমি বললাম, "বাক্সে কী?"

মামা বলল, "খুলেই দ্যাখ।"

তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে দেখলাম একটা বড় আতশ কাচ, লম্বা নাইলনের দড়ি, কয়েকটা ছোট ছোট শিশি সম্ভবত কেমিক্যালের, একটা নোটবই আর একটা রিভলভার। রিভলভার দেখে ছিটকে তিনহাত দূরে এসে আমি বললাম, "রিভলভার, তুমি মানুষ খুন করবে?"

মামা হেসে বলল, "না রে বোকা, শুনেছিস কখনও ব্যোমকেশ কাউকে মেরেছে। ওটা নকল, তবে দেখে বোঝা যায় না। এই কাজে ওরকম একটা অস্ত্র রাখতে হয়, না হলে ইমেজ তৈরি হয় না। আবার প্রয়োজনে ভয় দেখাতেও কাজে লাগবে।"

আমি আর মামা তক্কে তক্কে আছি, যদি একটা কেস পাওয়া যায়। কিন্তু চারপাশে সবকিছুই ম্যাড়মেড়ে। খুন-জখম তো দূরের কথা, ছোটখাটো চুরি-ছ্যাঁচড়ামিরও কোনও খবর নেই। এইভাবে দিনকয়েক চলার পর ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। একেবারে যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ঘটনাটা এইরকম, মা স্নান করতে গিয়েছিলেন, সাবান মাখার জন্য কানের দুল দুটো খুলে বাথরুমের তাকের উপর রেখেছিলেন। তারপর দুটোই পরেছেন কিনা মনে নেই। আমাদের খেতে দেওয়ার সময় হঠাৎ খেয়াল পড়ে ডান কানের দুলটা নেই। মা'র বিশ্বাস ওটা পরতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি ভাত ফেলে বাথরুমে যান, কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও দুলটা বাথরুমে বা ঘরের কোথাও পাওয়া যায়নি। বাবা মাকে একচোট বকাঝকা করে নিজের কর্তব্য যথাযথ পালন করেন। কিন্তু ঘরের ডিটেকটিভ উৎফুল্লমামা কেসটাকে হাতে নেয়। খাওয়াদাওয়ার পরে আমি আর উৎফুল্লমামা আলোচনায় বসি। সন্দেহের তালিকায় প্রথম নাম আমাদের কাজের লোক সরলামাসি। দ্বিতীয়, জমাদার

মামা-ভাগ্নের গোয়েন্দাগিরি

বিহারীলাল। সবশেষে বাবা। বাবার নামটা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সন্দেহের বাইরে রাখতে অনুরোধ করি, কিন্তু মামার মতে কাউকেই সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখা যাবে না।

প্রথমে সরলামাসিকে ডেকে মামা কয়েকটা প্রশ্ন করতেই সরলামাসি কেঁদেকেটে একাকার। আমাদের বাড়িতে গত বিশ বছর ধরে কাজ করছে। সুতরাং তাকে সন্দেহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই যেমন দুঃখ পেয়েছে তেমনই মামার উপর খ্যাপা। অনেক প্রশ্ন করেও কোনও ক্লু পাওয়া গেল না। মাকে জমাদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে মা বললেন, "আজকে জমাদারকে মেন গেট থেকেই বিদায় করেছেন, কারণ ছুটির দিন বাথরুম আটকে রাখা যাবে না। আসছে মঙ্গলবার ওকে আসতে বলেছেন। শেষে পড়ে রইলেন বাবা। মামা অনেক সাহস করে বাবার কাছে গিয়ে সবে জিজ্ঞেস করছেন, "জামাইবাবু, আপনি যখন বাথরুমে ...।" প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই বাবা মামার দিকে এমন কটমট করে তাকান যে, মামা ব্যাক-টু-প্যাভিলিয়ন। তবুও মামার বিশ্বাস সন্ধের মধ্যেই কেসটার সুরাহা করে ফেলবে, আর এক নম্বর টার্গেট সরলামাসি। বিকেলবেলা মা বারান্দায় বসে চুল বাঁধেন। আজও যখন বারান্দায় চিরুনি নিয়ে গিয়ে বসলেন তখন আমি ও মামা সেখানে হাজির। সরলামাসি আসবে চুল বেঁধে দেওয়ার জন্য। সরলামাসির বিহেভিয়ার স্টাডি করতে হবে, এটা নাকি মামার কথায় খুব ইম্পর্ট্যান্ট। মা স্নান করে চুলগুলো খোঁপা করে রেখেছিলেন। খোঁপা খুলতেই ঠং করে কানের দুলটা মেঝেতে আছড়ে পড়ল। মা বললেন, "এই তো!"

সরলামাসি এসে শুধু মামার দিকে কটমট করে তাকাল।

প্রথম কেসটা এরকম জোলো হয়ে যাওয়ার পর মামা একটু মনমরা। কিন্তু দ্বিতীয় কেস পেতে বেশি দেরি হল না। কে বা কারা আমাদের বাড়ির ডাবগাছটা থেকে সব ডাব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। মামা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এই দ্বিতীয় কেসটার সুরাহা করতেই হবে। সকালে ডাবগাছতলায় ঘন্টাখানেক আতশকাচ নিয়ে ঘোরাঘুরি করল। তারপর দুপুরে কোথা থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিস কিনে এনে ডাবগাছতলায় গিয়ে কাদা মাটিতে পড়া কয়েকটা পায়ের ছাপের ছাঁচ তৈরি করল। সন্ধের সময় দেখলাম টেবিলে পায়ের ছাঁচগুলো রেখে একমনে কিছু পড়ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম বইটার নাম, 'বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান'। বইটা মামার, আমিও পড়েছি। হাতের-পায়ের ছাপ, চুল, দাঁত, নখ, হাতের লেখা প্রভৃতি দেখে মানুষের আকৃতি, ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করার উপায় ওটায় লেখা আছে। পরদিন সকালে আমাকে ডেকে বলল, "শোন, ডাবচোর কে, সেটা আমি ধরে ফেলেছি। এই কেসটায় আমি একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছিলাম না।"

তাও বললাম, "কে?"

মামা বলল, "কালো, এটা কালোর কীর্তি। ও-ই রাতবিরেতে এইসব চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করা ধরেছে।" হঠাৎ মামা বলল, "তুই দরজার ওদিকটা যা তো!"

আমি দরজার কাছে যেতেই দেখলাম পরদার কোনা থেকে সরলামাসি সরে অন্য ঘরে চলে গেল। তার মানে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমি অবাক হয়ে মামাকে বললাম, "তুমি কী করে বুঝলে সরলামাসি দরজার কোনায় দাঁড়িয়ে?"

মামা বলল, "একেই বলে টিকটিকির চার চোখ। তুই খেয়াল করিসনি কিন্তু আমি খেয়াল করেছি যে, আমাদের বিড়ালটা এঘর থেকে ওঘরে যেতে দরজার সামনে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তার পরে ব্যাক করে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে গেল। তার মানে দরজার কাছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ও ডিটেক্ট করেছে। মামার প্রতিভা দেখে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কিন্তু কানের দুল চুরির পর মামা আর-একটা ব্লান্ডার করতে যাচ্ছে চিন্তা করে দুঃখও হল। বিকেলে আমি মাঠে ফুটবল খেলতে যাই। আজ মামাও আমার সঙ্গে গেল আমাদের খেলা দেখতে। ফিরে আসতেই মা কড়া গলায় আমাদের বললেন, "তোমরা কালোর সম্পর্কে কী বলেছ?"

আমরা বললাম, "কিছুই না তো!"

মা বললেন, "কিছুই না, এমনি এমনি কালোর বউ বিকেলে এসে একগাদা কথা শুনিয়ে গেল।" মামাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তুই বাড়ির মধ্যে ওইসব ডিটেকটিভ-টিটেকটিভ বন্ধ কর।" এই বলে মা রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

আমি মামাকে বললাম, "সরলামাসি নিশ্চয়ই তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে কালোর বউকে গিয়ে লাগিয়েছে।" যেটা বলতে পারলাম না সেটা আমার বন্ধু নিতাইরা পরশু সরস্বতী পুজোর দিন রাত জাগছিল। ওরাই ডাবগুলো চুরি করেছে। আমাকেও সেদিন রাত্রে দুটো ডাব খাইয়ে বলে ওটা আমাদেরই গাছের, আমাকেও দলে নিল যাতে বলতে না পারি।

এর পর মাসদুয়েক কোনও ঘটনা নেই, মামা পরপর দুটো কেসে লেজেগোবরে হওয়ায় একটু হতোদ্যম, আমাকে একদিন বলল, "বুঝলি ভাগ্নে, ডিটেকটিভ গল্প লেখা যতটা সোজা বাস্তবে কিন্তু অতটা সোজা কাজ না। লেখকরা সাজিয়েগুছিয়ে এমন ঘটনা লেখে যে,

ডিটেকটিভ সহজেই সেটার সুরাহা করে হিরো বনে যায়। কিন্তু এখন বুঝছি বাস্তবে ব্যাপারটা খুবই কঠিন কাজ।"

আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পোস্টটা ধরে রাখতে মামাকে সাহস জোগালাম, "শোনোনি, অন্ধকার টানেলের শেষেই আলো দেখা যায়, আমি বলছি বারবার তিনবার, তৃতীয় কেসে তুমি নিশ্চই সফল হবে।"

তৃতীয় কেস হাতে আসতে আর বেশি দেরি হল না। এবার আর যে-সে পাতি কেস না, রীতিমত ব্যোমকেশ, ফেলুদা স্ট্যান্ডার্ডের কেস। ঘটনাটা এরকম, আমাদের পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ির মন্দিরে চুরি হয়। চৌধুরীরা একসময় এই এলাকার জমিদার ছিল। পুরনো আমলের বিশাল বাড়ি, তার পাশেই বিরাট মন্দির। রাত্রে মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে চোরেরা প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকার পিতল কাঁসার বাসনপত্র ও বিগ্রহের সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। পরদিন জানাজানি হতে পুলিশ আসে। নিয়মমাফিক তদন্ত করে চলে যায়। তারপর উৎফুল্লমামা আমাকে নিয়ে চৌধুরীবাড়ি যায়। চৌধুরীমশাই গৃহদেবতার সঠিক দেখভাল না করতে পারার জন্য নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়েছেন। উৎফুল্লমামা তদন্ত করার জন্য ওঁর অনুমতি চায়। চৌধুরীমশাইয়ের পুলিশের উপর কোনও আস্থা নেই। মামার উপর যে আস্থা আছে তা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুমতি দেন। এর পর আমি আর মামা মন্দির আর মন্দির চত্বরে তন্নতন্ন করে ক্লু খুঁজে বেড়াই। কয়েক ঘন্টার চেষ্টাতেও কোনও ক্লু চোখে পড়ে না। মন্দিরের পূজারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি উনি রোজ সকালে পুজোআচ্চা শেষ করে চলে যান। মন্দির খোলা ও বন্ধ চৌধুরীমশাই নিজের হাতেই করেন। অবশ্য কী কী চুরি গিয়েছে তার বিস্তৃত ব্যাখা পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টা করেও আমরা কোনও ক্লু পাই না যা নিয়ে তদন্ত আগে বাড়তে পারে। মামা কয়েকদিন চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে বলে, "ভাগ্নে, আমার রাগটা কোথায় জানিস, এটা যদি কোনও ডিটেকটিভ গল্প হত তবে চোর কোনও না কোনও ক্লু নিশ্চয়ই ফেলে যেত। হয় জুতো না হয় রুমাল, নিদেনপক্ষে চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ির কোনও কাজের লোক লুকিয়ে আমাদের ফলো করত। কালই আমি ওই ডিটেকটিভ গল্পের বইয়ের গাদা রদ্দিয়ালার কাছে কেজি দরে বেচে দেব। যতসব গালগল্প, আর তাই পড়েই আমরা সব ডিটেকটিভ হিরো ভাবি। জামাইবাবু ঠিকই বলেছিলেন, 'কিছু করে দেখাও তারপর সাইনবোর্ড লাগাও, না হলে রং মেখে সঙ সাজার কোনও অর্থ নেই।' এর পর থেকে মামা সত্যি সত্যিই ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয়। চাকরির চেষ্টায় পুনরায় মনোনিবেশ করে আর রোজ বিকেলে আমার সঙ্গে মাঠে যায় আমাদের খেলা দেখতে।

সেদিন আমি আর মামা মাঠে গেছি। এখন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে। সৌরভ কালকেই কিনিয়ার এগেনস্টে বিরাট সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। আমরাও ফুটবল ছেড়ে এখন ক্রিকেট খেলা ধরেছি। আমরা খেলছি, মামা মাঠের পাশ থেকে টুকটাক নির্দেশ দিচ্ছে। খেলতে খেলতে আমার একটা বলে লিটন মিড অফ-এর উপর দিয়ে সহবাগ স্টাইলে বিরাট ছক্কা হাঁকাতে গেল। আমি বলটায় হরভজনের মতো একটু স্পিন দিয়ে দিয়েছিলাম। বলটা ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট কিপারের মাথার উপর দিয়ে সোজা মাঠের বাইরে। আমরা হইহই করে উঠলাম। লিটনকে বকাবকি করা শুরু হল কারণ ওদিকটায় জঙ্গলে বল হারিয়ে যায়। সবাই মিলে জঙ্গলে তোলপাড় করেও বলটা খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ছোটবেলায় পিন্টু খেলতে খেলতে বল হারিয়ে ফেললে ওই বুদ্ধিটা কাজে আসত। মাঠের পাশ থেকে বলের সাইজের একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে এনে লিটন যেখান থেকে ব্যাট করছিল সেখানে দাঁড়ালাম, তারপর বল যে পথে গিয়েছিল সেই পথে ইটের টুকরোটা ছুড়ে দিয়ে চোখ বুজে মন্ত্র আওড়ালাম, "বলের রং হলদি, বল বেরোবে জলদি।" তিনবার মন্ত্রটা আওড়ে দৌড়ে গেলাম জঙ্গলের দিকে। আমার বন্ধুরা খেয়াল করেছে ইটটা কোথায় পড়েছে। সবাই মিলে খুঁজতেই সেখান থেকেই বলটা পাওয়া গেল। মামা আমার বুদ্ধির তারিফ করল। একটা নতুন বল ডোনেট করবে বলে কথা দিল।

চৌধুরীবাড়ির মন্দিরে চুরি যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে দিন দশেক হয়ে গেল। পুলিশ চোরের কোনও হদিস এখনও পায়নি। মামাও ওই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে বলে মনে হয় না। এর মধ্যে আমাদের বাড়িতে একটা ছোট ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু মামার তাতে আর কোনও ইন্টারেস্ট আছে বলে মনে হয় না। আমাদের সিঁড়ির ঘরের এক কোনায় কিছু পুরনো আমলের কাঁসার বাসন পড়েছিল। একদিন দেখা যায় সেগুলো গায়েব। মা প্রথমেই মামাকে বারণ করেন সরলামাসিকে জেরা করতে বা এই নিয়ে মাথা ঘামাতে। কালোর বউয়ের অপমানটা সম্ভবত মার কাছে একটা আতঙ্ক হয়ে গিয়েছে, যা থালাবাটি খোয়া যাওয়ার চেয়েও বেশি দুঃখের। মামাও তার দিদির মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছে যে, বাসন কেন বাড়ি লুট হয়ে গেলেও মামার কিছু আসে-যায় না।

সবাই নিজের স্বার্থই দেখছে। তোপসে বা সন্তু হওয়ার আমার যে অ্যাম্বিশন ছিল সেটা যে ভেঙে চুরমার, সে ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা নেই। মামার উপরও রাগ হয়, যেহেতু নিজের ক্যালিবার নেই সেহেতু

মামা-ভাগ্নের গোয়েন্দাগিরি

আমার ফিউচারটাও ডুম করে দিল।

সেদিন ছিল রবিবার। মামা সকাল আটটা নাগাদ বেরিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাচ্ছ?"

মামা বলল, "ঘন্টাতিনেক পরেই জানতে পারবি।

তখন সাড়ে দশটা এগারোটা বাজে। আমরা কয়েক বন্ধু রাস্তার মোড়ে গল্প করছি। রবিবার বলে পাড়ার রাস্তায় লোক সমাগম বেশিই। হঠাৎ দেখলাম থানার জিপ প্রবল বেগে আমাদের সামনে দিয়ে গিয়ে চৌধুরীবাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরে কানাইদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমরাও জিপের পিছনে পিছনে দৌড়ে ওখানে পৌঁছে গেছি। বড়বাবু একলাফে নেমে সোজা কানাইদের বাড়ি ঢুকে গেল। তারপর কানাইকে কলার ধরে এনে জিপে তুলে ফের ফিরে এলেন চৌধুরীবাড়ির মন্দিরের সামনে। ইতিমধ্যে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। জিপ থেকে বড়বাবু, উৎফুল্লমামা নামল। তার পিছনে একজন কনস্টেবল কোমরে দড়িবাঁধা একটা লোককে ও কানাইকে নিয়ে এসে দাঁড়াল মন্দিরের সামনে। ইতিমধ্যে চৌধুরীমশাইও সেখানে হাজির।

বড়বাবু বললেন, "চৌধুরীমশাই, এই কানাই'ই আপনার মন্দিরে সেদিন চুরি করে। তবে ওকে ধরার পুরো কৃতিত্বটাই উৎফুল্লবাবুর। ওঁর মুখেই ঘটনাটা শুনুন।"

উৎফুল্লমামা আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকাল। বড়বাবুর অনুরোধে সামনে এসে বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আসলে কৃতিত্বটা আমার না, আমার ভাগ্নে কাম অ্যাসিস্ট্যান্ট নন্দুর।"

এবার আর কয়েক জোড়ার ব্যাপার নয়, কয়েকশো জোড়া চোখ আমি দেখতে পেলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাবড়ে গিয়ে দরদর করে ঘামতে শুরু করলাম। আমি তো এর বিন্দুবিসর্গও জানি না, এখন আমাকে যদি সবাই জিজ্ঞেস করে তো কী উত্তর দেব। বুকে বল পেলাম মামা আবার মুখ খোলায়।

মামা জমায়েতের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই কেসের তদন্তে আমি কোনও ক্লু খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন নন্দুর একটা থিওরিতে নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলাম। থিওরিটা আর কিছু না, ওদের খেলার বল জঙ্গলে হারিয়ে যায়। নন্দু একইভাবে একটা ঢিল ছুড়ে বলটাকে লোকেট করে। যাকে বলা যায় থিওরি অফ রেসিপ্রোসিটি। এর পর আমি কেসটা নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করি। চুরি যাওয়া মাল চোর নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও বেচেছে। সেইমতো নিজের বাড়ির কিছু কাঁসার বাসনপত্র সরিয়ে সেগুলি বেচতে আমি এখানকারই কয়েকটি দোকানে যাই। সব দোকানদারই বলে যে, তারা কাঁসার পিতল বিক্রি করে কিন্তু পুরনো জিনিস কেনে না। খুঁজতে খুঁজতে আমি জানতে পারি স্টেশনের গা ঘেঁষা 'পিতলশ্রী' বলে যে দোকানটা আছে তারাই একমাত্র পুরনো জিনিস কেনে। ওখানে গিয়ে আমি প্রথমে আমার মালগুলি বেচি। তারপর সেই টাকায় একটা পুরনো একশো-আট প্রদীপদানি কিনতে চাই। পিতলশ্রীর মালিক যে আপনাদের সামনেই কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে একটা সুন্দর প্রদীপদানি দেখায়। প্রদীপদানিটা নেড়েচেড়ে দেখার ছলে আমি দেখি যে, ওর নীচে তিনটে পায়ার একটা ভাঙা যেখানে ছোট একটা কাঠের টুকরো আঠা দিয়ে লাগানো। এই মন্দিরের পুরোহিতমশাইকে জেরা করে আমি এই তথ্যটা পেয়েছিলাম যে, চুরি যাওয়া প্রদীপদানির নীচে একটা পায়া ভাঙা ও সেখানে একটা কাঠের টুকরো লাগানো। তারপর টাকা কম পড়েছে বলে বলি যে, কালকে টাকা নিয়ে এসে প্রদীপদানিটা আমি কিনব। সেইমতো আজ সকালে থানার বড়বাবুকে সব ঘটনা বলি। উনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন ও আমার সঙ্গে পিতলশ্রীতে গিয়ে মালিককে চাপ দিতেই ও বলে দেয় যে, দিনদশেক আগে কানাই ওকে এটা বিক্রি করে। এইবার মামা কোমরে দড়ি বাঁধা লোকটা ও কানাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, "কী কানাই, কথাটা কি ঠিক?"

কানাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মামা আমার হাতে একটা থলি দিয়ে বলে, "ভাগ্নে, এগুলো বাড়িতে নিয়ে যা। আমাদের বাড়ির কাঁসার বাসনপত্রগুলো এর মধ্যেই আছে।" বড়বাবু জিপে করে কানাইদের নিয়ে চলে যান। চৌধুরীমশাই মামার হাত ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "উৎফুল্ল, তুমিই আমাকে বাঁচালে। গৃহদেবতার ঘরে চুরি যে কতটা অমঙ্গলের, কতটা দুঃখের, তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।" এর পর মামাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। উপস্থিত জমায়েত মামার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

পরদিন সকালে আমি আর মামা আমাদের ঘরে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ বাবার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। বাবা মাকে বলছেন, "এইটুকু-এইটুকু ছেলে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার। তুমি কিছু বলতে পারো না? এসব কাজ কি আমার কর্ম! এই বয়সে পড়ে হাত-পা ভাঙলে আর জোড়া লাগবে?"

আমি আর মামা ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠি। বাইরে বেরিয়ে দেখি বাবা একটা ছোট মই নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা টিনের রংচঙে বোর্ড, তাতে লেখা, "আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। প্রাইভেট গোয়েন্দা শ্রীপ্রফুল্ল সরকার।"

ছবি: দেবাশিস দেব